বেলা অবেলার কথা

ট্রাইকোগ্রামা জাহিরি, ড. জহির, ক্যান্সার এবং একাত্তরের গেরিলা

ড. জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস

দৈনিক জনকণ্ঠে একসময় 'একাত্তরের গেরিলা' শিরোনামে একটি লেখা কিছুদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সময়ের প্রেক্ষাপটে সাহসী লেখাটির কয়েক সংখ্যা মাত্র আমি পড়তে পেরেছিলাম। বিষয়টিই যেন মুখ্য ছিল। তাই লেখক কে তা খেয়াল করিনি। জহির ভাই তখন বোধহয় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ইরি) পোস্ট-ডক ফেলো হিসেবে কাজ করতে যান। আর আমি ইরি থেকে পিএইচডি শেষ করে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে (ব্রি) ফিরে আসি। একদিন দেখি ড. মহিবুল হাসান বুলবুল (আমাদের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী) একগাদা পেপার কাটিং ভরা খাম বিদেশে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। প্রাপকের ঠিকানা ছিল ড. জহিরুল ইসলাম, ইরি, ফিলিপিন্স। পেপারকাটিংগুলো আর কিছুই না, জনকণ্ঠের সেই লেখাগুলো। এর আগে জহির ভাই যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তা শুধু আমি নই আমাদের অনেকেই জানতেন না। কীভাবে জানব? তিনি তো কখনও আমাদের তা বলেননি। আমাদের বিজ্ঞানী একাত্তরে ঢাকা শহরের পাকিস্তান হানাদারদের পিলে-চমকানো দুর্ধর্ষ গেরিলা বাহিনীর সদস্য ছিলেন এবং তা এভাবে পত্রিকায় লিখে আমাদের জানাবেন তা সত্যি তখন কল্পনার অতীত ছিল। পরে কে যেন বলেছিল, একাত্তরের এ জলজ্যান্ত গেরিলা নাকি যুদ্ধের পরে সার্টিফিকেটের চিন্তাও করেননি। ভাবটি এমনই ছিল যে কি হবে সার্টিফিকেট দিয়ে। দেশটি তো পাওয়া গেল; যার জন্য যুদ্ধ। দশাসই চেহারার মানুষটি আর তার প্রত্যয়দীপ্ত কথা শুনলে যে কোনো ব্যক্তির এমনি মনে হওয়া স্বাভাবিক।

ড. জহির একজন উঁচুমানের বিজ্ঞানী ছিলেন। ছিলেন বলছি কেন এখনও আছেন। ব্রিতে থাকলে বছরপাঁচেক আগেই অবসরে যেতেন। কিন্তু অবসরে না গিয়ে চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি কানাডায় অভিবাসী হন। আমাদের জন্য ব্রেইন ড্রেইন আর কি। তিনি তো সাধারণের মতো কেউ ছিলেন না। কেন যে চলে গেলেন আজও আমার মাথায় আসে না। তবে বাইরে চলে গেলেও তিনি প্রায়ই দেশে আসতেন। দেশের হয়ে তার বিষয়েই কোন গবেষণা সংস্থার হয়ে কনসালটেন্সি করতেন। ইরিতে বেশকিছু দিন বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এক সময় ইরির রিপ্রেজেনটেটিভ টু বাংলাদেশ হিসাবে কাজ করারও উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে নিজের নামটি প্রত্যাহার করে নিয়ে একজন জ্যেষ্ঠ সহকর্মীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন। উল্লেখ্য, উক্ত জ্যেষ্ঠ সহকর্মীও এক সময় ব্রি-তে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। এহেন জহির ভাই আজ ক্যান্সারে আক্রান্ত। তবে কিছুদিন আগেও দেশে এসেছিলেন। কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের হয়ে কিছু কাজ করেছিলেন। আরও কিছু কাজ করার কথা ছিল। তবে করা হয়নি। হয়তো বা ক্যান্সারের কারণেই। তিনি ফিরে গেছেন। প্রথমে আমরা কেউ জানতে পারিনি। তবে ফিরে যাওয়ার পরে তার ল্যাবের সহকর্মীদের কাছে একটি মেইল পাঠিয়েছিলেন। আমরা সেই সূত্রেই জানতে পারি। তিনি যকৃতের ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং সেটা নাকি ফুসফুস পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

ক্যান্সার নিয়ে আমার কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই। আমার নিকটজনের কারুরই এমন রোগে আক্রান্ত হতে দেখিনি। তবে সম্প্রতি দেবাহুতি চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। তিনি ক্যান্সার আক্রান্ত। ভদ্রমহিলা তার লেখা একটি বই 'সাথে ক্যান্সার, ক্যান্সারের সাথে' আমাকে উপহার হিসেবে দিয়েছেন। তিনি এ বইয়ে রোগটি নিয়ে তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। সে অভিজ্ঞতার পুরোটাই যে যন্ত্রণাকাতর এমন নয়। এ ধরনের মারণব্যাধি নিয়েও যে আমরা হেসেখেলে চলতে পারি তেমন কিছু দিক-নির্দেশনা এ বইয়ে আছে। বেশ আগে জাহানারা ইমামের ক্যান্সারের সাথে বসবাস' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। পড়া হয়নি। তবে বইটি নিয়ে পেপার-পত্রিকায় যেসব আলোচনা ছিল তা আমি পড়েছি। জহির ভাই তার মুক্তিযোদ্ধা সহকর্মীর রুমির মায়ের লেখা বইটি নিশ্চয়ই পড়েছেন। তিনি দেবাহুতি চক্রবর্তীর বইটিও পড়ে দেখতে পারেন।

অসুখ-বিসুখ জীবনের স্বাভাবিক একটি প্রপঞ্চ। শরীরের কোনো না কোনো অসুবিধা বা অসুখ না হলে কেউ মারা যেত না। ক্যান্সার ছাড়া আর সব অসুখ নিয়ে আমরা খুব একটা বিচার-বিশ্লেষণ করি না। তা যতই মারাত্মক হোক না কেন? কিন্তু ক্যান্সারকে কেন যেন সাক্ষাৎ যমের মতো ভয় করি। ব্যাধিটির সহজে নিরাময় যোগ্য নয় বলেই হয়তো বা এমন ধারণা। আর এ থেকেই আমরা জহির ভাইর মনের স্বাভাবিক অবস্থা কী হতে পারে তা কিছুটা কল্পনা করে নিতে পারি। তবে জহির ভাই বলে কথা। সম্প্রতি ফেসবুকে তার বেশকিছু ছবি প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলো দেখে মনে হয় জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম অনুযায়ী তিনি আর সবার মতো কিছুটা সংশয়ে আছেন। তবুও তার হাসিটা বলে দেয় তিনি এখনও মরণব্যাধিটির সঙ্গে লড়ে যেতে প্রস্তুত।

মনে পড়ে কি দুর্দান্ত স্বাস্থ্য ছিল তার। নিয়মিত জগিং করতেন। আজ থেকে বিশ-তিরিশ বছর আগে হাফ-্যান্ট পরে ব্রি-বারির ক্যাম্পাসে জগিং করা ব্যাপারটি মোটেই স্বাভাবিক ছিল না। তিনি কাজের প্রতি সিরিয়াস ছিলেন। কাজ করতেন মাঠে। কাঠফাটা গরমে। কখনও এক-দেড় তাল গভীর বিলের পানিতে। কারণ তিনি জলি আমন ধান নিয়ে কাজ করতেন। ব্রির বিজ্ঞানী হলেও ব্রিটিশ সরকারের একটি প্রকল্পের (ঙউঅ) সঙ্গে তার ছিল নিবিড় যোগাযোগ। তখন ডেভিড ক্যাটলিং বলে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এ প্রকল্পের দায়িত্বে ছিলেন। আমরা দেখেছি জহির ভাই সকালে বেরিয়ে যেতেন। হয়তো দাউদকান্দি, সোনারগাঁ কিংবা মানিকগঞ্জের উদ্দেশে। কখন ফিরতেন জানিনা। তার কাজের অনেক ছবি আমরা দেখেছি। ক্যাটলিংয়ের রাইস ইন ডিপ ওয়াটার (জরপব রহ উববঢ় ডধঃবৎ) বইটি-তে এর কিছু প্রমাণ আছে। জলি আমন ধান নিয়ে কাজ করা কতখানি কষ্টের তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের আগের যুগের বিজ্ঞানী ড. আলীম, ড. হাসানুজ্জামান, ড. জে এল সেন, ড. নূর মোহাম্মদ, ড. নাসির এবং আরও অনেকেই ভালো করে তা জানতেন। আর এ কারণেই বোধহয় জলি আমনের কোনো আধুনিক জাত আমরা আজও বের করতে পারিনি। জলি আমন নিয়ে গবেষণার জন্য চাষির জমিতে সরাসরি কাজ করতে হয়। বৈরী পরিবেশে অভিযোজন উপযোগী এ ধান বৈশাখে বুনতে হয়। তারপর শ্রাবণ-ভাদরের পানির সঙ্গে বাড়তে থাকে। পরে আশ্বিনে পানি কমার সঙ্গে সঙ্গে গাছ হাঁটু গেড়ে বসে। তারপর কার্তিক-অঘ্রাণে শিষ বের হওয়া এবং পৌষ পর্যন্ত ফলনের জন্য অপেক্ষা। ড. জহির এ ধানের কীটতত্ত্ব বিষয়ে কাজ করতেন। তবে প্রয়োজনে কৌলিতত্ত্ব বা কৃষিতত্ত্ব এমনকি শারীরতত্ত্ব বিষয় নিয়েও তাকে কাজ করতে হয়েছে। কারণ ডেভিড ক্যাটলিং এবং ব্রির আর সব সহকর্মীরা তার সঙ্গে ছিলেন। ব্রিটিশ এ প্রকল্পের বদান্যতায় লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজ থেকে তিনি এমএস এবং পিএইচডি করেছেন। প্রকল্পটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরে, তিনি আবার তার আসল জায়গায় ফিরে আসেন এবং কীটতত্ত্ব বিয়য়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক অনেক কাজ করেন। তার কয়েটি উদাহরণ আমি এখানে দিচ্ছি।

এক সময় দেশে পামরি পোকার ভীষণ উৎপাত ছিল। এখনও যে নেই তা বলব না। তবে আগের তুলনায় বেশ কম। পো্যাকাটিকে কোথাও লোহাজুড়ি, কোথাও বা মরিচা পোকা বলে। গায়ে কাঁটা আছে। তাই ফিঙে পাখিরও এ পোকায় অরুচি। সে কারণেই এ পোকা দমন বেশ কষ্টসাধ্য। এক মাত্র হাতজালি বা কাপড় টেনে এ পোকা ধরার পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া উপায়ও নেই। কারণ এ পোকা হঠাৎ কর্হে এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে কীটনাশক দিয়ে দমন করার কোন উপায় থাকে না। যাহোক ড. জহির এবং তার গবেষণাগারের বিজ্ঞানীরা এর বিকল্প চিন্তা করছিলেন। এ পোকার জীবতাত্ত্বিক দমন ব্যবস্থার কথা ভেবে অনুসন্ধান শুরু করেন এবং এক ধরনের বোলতা গ্রোত্রের একেবারে নতুন জাতের লার্ভাখাদক অনুপোকার সন্ধান পান। সেটা ছিল একেবারেই নতুন আবিষ্কার। পরে লন্ডনের প্রাকৃতিক মিউজিয়ামের সুপারিশ ক্রমে অনুপোকাটির নামকরণ করা হয় ড. জহিরের নামে ট্রাইকোগ্রামা জাহিরি, (ঞৎরপযড়মৎধসসধ ুধযরৎর)। জহিরের ভাইয়ের বুদ্ধিদীপ্ত গবেষণার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। এ অনু পোকা নিয়ে এখন আরও অনেক কাজ হয়েছে। এখন যদি আবার পামরি পোকার আক্রমণ হয় তাহলে জীবতাত্ত্বিক উপায়ে ক্ষতিকর পোকা দমনের কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হতে পারে।

ড. জহির যে শুধু বিজ্ঞানী ছিলেন এমন নয়। তিনি একজন দরদি মনের সমাজ সচেতন মানুষ ছিলেন। ১৯৮৮ সালের প্রলয়ঙ্করী বন্যার কথা আমাদের মনে আছে। সে বছর সারাদেশ পানির নিচে তলিয়ে যায় বেশকিছু দিনের জন্য। জনদুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। তিনি তখন সাধারণ স্তরের একজন কর্মকর্তা। অথচ তিনিই কিনা একেবারে খালি হাতে মানব সেবায় এগিয়ে এসেছিলেন। হ্যাঁ প্রথমে তার হাত খালিই ছিল। পরে তিনি একক প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের সঙ্গে যোগাযোগ করে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য কয়েক লাখ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। তা দিয়ে চাল-ডাল-ওষুধপত্রসহ স্যালাইন প্রস্তুতির যাবতীয় সামগ্রী কেনা হয়। তার নেতৃত্বে স্যালাইন বানিয়ে নৌকা ভাড়া করে ব্রি বিজ্ঞানীরা সে সময় গাজীপুরের প্রত্যন্ত এলাকায় সেগুলো প্রায় ১৫ দিন ধরে বিতরণ করে বেড়ায়।

আগেই বলেছি তিনি এক সময় ইরিতে পোস্ট-ডক ফেলো ছিলেন। পরে এক সময় ইরির বিজ্ঞানী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান। এখানেও তিনি বেশ ক্যারিশম্যাটিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। তার কাজের ধরন একটু ভিন্নধর্মী ছিল। আমি একটু বলছি। গতানুগতিক কৃষিবিদ্যায় ফসল আবাদের সময়ে জমি নিখুঁতভাবে পরিষ্কারের কথা বলা হয়। চাষিরা তাদের সাধ্যমতো সেটা পালনও করে থাকে। ফলে জমির আইলের কিনারের জীববৈচিত্র্যে প্রভাব পড়তে পারে। প্রকৃতপক্ষে পড়ে থাকে। বন্ধু পোকার সংখ্যা কমে যায়। বিষয়টি আগে তেমন করে কেউ মাথায় আনেনি। ড. জহিরের কাজ ছিল আইলের কিনারের ঘাস রেখে দিয়ে যদি জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা যায় তাহলে কেমন হয়। তার পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এভাবে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে পারলে জমিতে পোকার উপদ্রব কমে যায়। কারণ জমিতে অবস্থানকারী সাপ-ব্যাঙ এবং অন্যান্য পোকাখাদক প্রাণী বা পোকারা দিব্যি তাদের বংশ বিস্তার করতে পারে। এ অভিনব চিন্তাটির বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে সম্প্রতি ব্রি একটু ভিন্নভাবে ভাবছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা এখনও জমির কিনারায় ঘাস-জঙ্গল রাখতে হবে

এ কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। তারা আইলের ওপর গাঁদা জাতীয় ফুল চাষের কথা বলছে। কারণ ফুলের গাছে বন্ধু পোকার আনাগোনা বেশি। যাহোক বিষয়টি জহির ভাইয়ের চিন্তারই পরবর্তী সংস্করণ বলা যায়।

গবেষণার পাশাপাশি ড. জহিরের প্রকাশনার সংখ্যাও যথেষ্ট। তার এখনও পর্যন্ত শেষ গবেষণাপত্রটি আমি আমাদের রাইস জার্নালে প্রকাশ করেছি। এখানে সহলেখক আছেন সেই ডেভিড ক্যাটিলিং। বহু আগের করা কাজটির আবেদন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। কারণ পেপারটিতে আমাদের প্রেক্ষাপটে ধান এবং ধানের জমির প্রতিবেশে যত রকম পোকামাকড়ের উপদ্রব হতে পারে তার একটি বিস্তারিত তালিকা দেয়া আছে। এছাড়াও ড. ক্যাটলিংকে সঙ্গে করে তিনি জরপব চবংঃঃং ড়ভ ইধহমষধফবংয : ঞযবরৎ ঊপড়ষড়মু ধহফ গধহধমবসবহঃ শিরোনামে বেশ বড় (৪২২ পাতা) সাইজের একটি জ্ঞানগর্ভ বই লিখেছেন। আন্তর্জাতিক মানের বইটি প্রকাশ করেছেন দি ইউনিভার্সিটি প্রাইভেট লিমিটেড।

তার সাম্প্রতিকতম প্রকাশনা হলো 'মুক্তিযুদ্ধে মেজর হায়দার এবং তার বিয়োগান্তক বিদায়' অত্যন্ত চমৎকার একটি মুক্তিযুদ্ধের বই। এ বইটির জন্য তিনি ওঋওঈ ব্যাংক পুরস্কার পেয়েছেন।

কিছুদিন আগেও তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। আমার বিশ্বাস তদ্দিনে তিনি জেনে গেছেন তিনি ক্যান্সারের ঝুঁকিতে আছেন। তবুও ঢাকা এবং তার আশপাশে যেখানে যুদ্ধ করেছিলেন সেসব জায়গায় তিনি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছেন। তিনি রূপগঞ্জে গিয়েছিলেন। জায়গাটি ছিল যুদ্ধকালীন গেরিলা যোদ্ধাদের আশ্রয় নেয়ার জায়গা। সে বর্ণনা তিনি দৈনিক সংবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তার হয়তো আরও পরিকল্পনা ছিল। আমি জানিনা সে পরিকল্পনা আদৌ বাস্তবায়িত হবে কিনা। এ ব্যাপারে ব্রির পক্ষ থেকে একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা বিজ্ঞানীর জন্য যদি আমাদের কিছু করার থাকে আমরা করব। আর কী আর বলার আছে। জহির ভাই ভালো থাকুন। অবশেষে রবি ঠাকুরে ভাষায় বলতে হয়- আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু/ বিরহ দহন লাগে;/ তবুও শান্তি তবু আনন্দ/ তবু অনন্ত জাগে।/ তবু প্রাণ নিত্য ধারা, হাতে সূর্য চন্দ্র তারা/ বসন্ত নিকুঞ্জে আসে বিচিত্র রাগে/ তরঙ্গ মিলায়ে যায়, তরঙ্গ উঠে/ কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কুসুম ফুটে;/ নাহি ক্ষয়, নাহি শেষ, নাহি নাহি দৈন্য লেশ/ সেই পূর্ণতার পায়ে মন স্থান মাগে।

[লেখক : মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট]